



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.73-78

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

ময়মনসিংহ জেলার আদিবাসীদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংকটের ইতিহাস: উপনিবেশিকতার প্রেক্ষিতে

সন্দীপ সাহা

সহকারি অধ্যাপক, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

As a pargana in the Yemant region, it was different from Rajmahal, Dhaka or Murshidabad at different times. The type of fatwa is trying to strengthen control over the country. Over time, caste Hindu landlords and Muslim farmers settled on these tribal groups. Nandi clans like Oudhuri, Naga, Mitra and Bakshi etc. are the original landlords in this region. Now we can say that at the beginning of the 18th century the tribes like Garo, Hajong, Hadi, Banai etc. were of the Brahmin system. Outside of the larger population groups, the intercultural differences between them were much less. Foreign rulers are very special among these groups Bhushi is praised for his qualities. It is not said how the state and others Many times the desire to integrate caste society across communal and group divides has been imposed for the sake of social welfare. The desire to become a Bhakta within the Kaum Vittika Ya Gauth Goshti concept is encouraged through various events.

Keywords: Caste, state

যেকোনো সীমান্ত অঞ্চলের মতো ময়মনসিংহ জেলা তথা শেরপুর পরগনার রাজনৈতিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় রাজ শক্তির সর্বব্যাপী চাপ শিথিল ছিল। সীমান্ত অঞ্চলের পরগনা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে রাজমহল, ঢাকা বা মুর্শিদাবাদ থেকে বিভিন্ন ধরনের ফতোয়া শিথিল নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে জনগোষ্ঠীর স্বকীয় উদ্যোগ পলাতক ও ভাগ্যাননসি যোদ্ধার উদ্যম জুজুধান গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়া ইত্যাদি প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং এক ধরনের স্বনিয়ন্ত্রিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক কাঠামোর জন্ম হয়েছিল যেখানে প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সাহায্য ও প্রাক অনুমতি ব্যতিরেকেই স্থানীয় ক্ষমতার অধিকারীরা তাদের মতো করে বিবাদ করতে পারতো আবার বিরোধের নিষ্পত্তিও করতে পারতো।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও লৌকিক ঐতিহ্য অনুসারে শেরপুরের রাজনৈতিক কাঠামোর মূলে ছিল কোচ সামন্ত ও গারো হজম ইত্যাদি গোষ্ঠীর নেতাদের প্রভাব ও ক্ষমতা। জঙ্গলাকীর্ণ ভাটি এলাকায় কোচ সামন্তরা ও হজং নেতারা বসতি স্থাপন করে এবং রানীশিমুল রানীগাও কোচিনি পাড়া মালকোজ টাউকোচা ইত্যাদি গ্রাম স্থাপিত হয়। অন্যদিকে উপশৈল প্রদেশে গড়ে ওঠে গারো উপজাতীয়দের এলাকা। চাঁদগাও হাতিবান্দা নৈয়ারিকুড়া নাকগাঁও কাঁকরকাঁদি ইত্যাদি এলাকা এদের ক্ষমতা ও কীর্তির স্মৃতিবিজড়িত। নৈয়ারী কুড়াকেই কেন্দ্র করে কাছারিরায় ও সোনারায় নামে বন্য সরদার পাহাড় অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই উপজাতিগোষ্ঠীর উপর বসতি স্থাপন করে বর্ণ হিন্দু জমিদার ও মুসলমান কৃষকেরা। নন্দীবংশীয় চৌধুরী, নাগ, মিত্র ও বস্তু ইত্যাদি পরিবার এ অঞ্চলের আদি ভূস্বামী। নানা সময়ে এরা বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে ও অধিকার বিস্তার করে। ঘোষণাও ও বনাই গ্রামে গারো উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নন্দীরা ও ঘোষেরা তাদের উচ্চতর রাজস্ব কায়েম করে। পাইকুরাতে মৌলিকরা বসবাস করে ও উপজাতিদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। বোখাউড়া ও বাগনিয়া তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বসতি গড়ে ওঠে ও উত্তর শেরপুরের নানান উপপর্বতীয় গ্রাম দেবত্ব সম্পত্তি হিসেবে দান করা হয়। কায়স্থ তালুকদার হরচন্দ্র নাগ শেরপুর অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এইসব গ্রামে কোন না কোন পর্যায়ে বহিরাগত জমিদারদের সঙ্গে উপজাতিগুলোর বিরোধ দেখা দেয়। আমার অনেক সময় উপজাতিদের আক্রমণ রোধ করার জন্য অন্যান্য এলাকা থেকে কৃষিকাজে দক্ষ প্রজা এনে বসতি স্থাপন করতে জমিদাররা উৎসাহ দেন।¹ ফলে ঊনবিংশ শতকে শেরপুর অঞ্চলে উপজাতি ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি কৃষকদের অস্তিত্বের কথা ইংরেজ শাসকরা স্বীকার করে। মদের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়ার সময় গিরোদ-গারো'র বাঙালি ও গারো কৃষকদের যৌথ মতামতের কথা জানতে চাওয়া হয়²। আরেকটি বিস্তৃত বিবরণ বলা হয় যে, ১৭৯০ সালেই ইলিয়ট সাহেবের আমলে প্রথম বন্দোবস্তের সময়ে ঘোষণাওতে 'বাঙালি' ও 'গারো' কৃষকদের উপর বিভিন্ন হারে 'জমা' ধার্য করা হয়। এইখানে গারোদের আবাদী ও পূর্ব অধ্যুষিত জমিতেই বাঙালি কৃষকরা পড়ে চাষ করে এবং সময়সময়সময় আদিবাসিন্দা গারোদের 'নালবন্দী' বলে প্রথাসম্মত উপহার বা নজর দেয়।³ এইসব অঞ্চলের সমতলবাসি কৃষকদের ব্যাপক অংশ মুসলমান ছিল। ওসমান ও মুসা খানের নেতৃত্বে আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে শেষ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে গড় জরিপা, বোকাইনগর, তাজপুর, জঙ্গলবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় মুঘল শাসন থেকে পলাতক আফগান বিদ্রোহীদের বসতি গড়ে ওঠে এবং সীমান্ত অঞ্চলে চাষবাস শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়ে ওঠে দরগা ও মসজিদ।⁴ যেমন বাকি মিয়ার মসজিদ, সফু মৃধার মসজিদ, হটিলা মিয়ার দরগা, মহলুম গাজীর দরগা, মৃজা মেন্দি বেগের মসজিদ। গ্রাম গ্রামাঞ্চলে নিম্ন জাতীয় মুসলমান ও উপজাতীয়দের মধ্যেও গড়ে ওঠে এইসব পীরদের আস্তানা, চলে তাদের প্রচারকার্য; যেমন কোচিনি পাড়া, বাঘবেড়, নাঙ্গলবোড়া ও গামারীতলার মসজিদ।⁵

এই মুসলিম জনসমাজ, পীর ও ধর্মপ্রচারকদের আড্ডা, উপজাতীয় কৃষকদের গ্রাম ইত্যাদি মিলেমিশে শেরপুর পরগনার লৌকিক সমাজের চেহারা গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গারো,

¹ উচ্চবর্ণের বসতি স্থাপনের ইতিহাস, হরোচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুরের বিবরণ, ত্রয়োদশ অধ্যায় (গ্রাম বিবরণ), পৃষ্ঠা ১৫৫ - ১৫৭; সৌরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার, কলিকাতা, ১৩১৭, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৫।
Bhupendra Chandra Sinha, Changing Times, Calcutta, 1955, Chapter six.

² J. Dunbar's letter, 27th Dec, 1828, BRL, 10th Jan, 182, No. 23.

³ W. Dampier to John A'hmuty, 30th Dec, 1825, JC, 2nd Feb, 1826, prog. 44, New Delhi Reprint, 1978, p. 60.

⁴ আফগান প্রতিরোধের কাহিনী, M.I. Broach অনুদিত মির্জা নাথান রচিত Baharistan Ghayby, প্রথম খন্ড, Ghosh, the pagalpan this of Mayensingh, BPP Vol. 27, No. 53-54, 1924, p. 42. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা, 1926, 2 য় খন্ড, পৃষ্ঠা 361-62, 368-368.

⁵ হরচন্দ্র চৌধুরী, p. 106.

হাজং, হাদিরা বর্ণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে আরম্ভ করে। গারোদের একাংশ, বিশেষত, যারা 'লামদানি' বা যারা সমতল ভূমিতে বাস করে, তারা ডালু, বানাই ও হাজংদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে নিম্ন বর্ণের হিন্দুতে রূপান্তরিত হতে চেষ্টা করে, আবার যদি হাদি ও হাজংদের মধ্যে কেউ কেউ ভূইমালিদের মধ্যেও মিশে যেতে চায়। ১৯৩০ সালের মধ্যে এই উপজাতিগোষ্ঠীগুলো বর্ণের ক্রম অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদায় বিভক্ত হয়। রাজবংশী ওরা সবচাইতে উঁচু স্থান পায়, গারো ও মান্দা এরা ক্রমানুযায়ী নিম্নতম বিন্দুতে থাকে, হাজংরা মধ্য পর্যায়ে অবস্থান করে। জাতে ওঠার বিষয়ে শেরপুরের জমিদার ও বৈষ্ণব-প্রচারকদের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়, ফলে ছোট ছোট পার্বত্য গোষ্ঠীদের মধ্যে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা নিয়েও বিরোধ দেখা যায়।⁶

এখন আমরা বলতে পারি যে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে গারো, হাজং, হদি, বনাই প্রভৃতি উপজাতি ব্রাহ্মণ ব্যবস্থার বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, এদের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক তফাতো অনেক কম ছিল। হাঙ্গামাকারী উপজাতিদের অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে গারো, হাজং, কোচ ইত্যাদি বলে একচ্ছত্রে উল্লেখ দেওয়া হতো।⁷ এমনকি ঊনবিংশ শতকে তিনের দশকেও শেরপুরের উপজাতিদের সাধারণভাবে 'গারো কৃষক' বলেই আখ্যা দেওয়া হয়।⁸ প্রথমদিকে ১৮৬০ সালে সরকারি প্রতিবেদনে হাজংদের বলা হয় 'মিশ্র গারো' (a race of mongrel Garod)। ১৯০২ সালের আদমশুমারি তে ডালুদের বলা হয়েছে গারোদের 'হিন্দু ভাবাপন্ন গোত্র'।(a Hinduised section of Garod). এই সময়ে আদমশুমারির প্রতিটি জাতি ও উপজাতিকে বর্ণ বা গোত্র অনুযায়ী ভাগ করার জন্য সরকারি প্রয়াস লক্ষণীয়। আদমশুমারির সুযোগে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের স্বীকৃতি লাভের প্রচেষ্টা এবং নিজেদেরকে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার চাহিদা এই প্রত্যন্ত দেশের উপজাতিদের নাড়া দিয়েছিল।⁹

সংস্কৃতায়নের প্রচেষ্টার সঙ্গে যৌথ আচার ও কৌমবন্ধনে অবস্থিতির নিদর্শন এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগেও দেখা যায়। কার্তিক পূজা উপলক্ষে এবং খলকুমারীর পূজা উপলক্ষে যেসব উৎসব, নৃত্যগীতাদি হাদি ইত্যাদি আদিবাসীরা করে থাকে, তা অতি 'অশ্রীল', 'ভদ্রলোকের দর্শন ও শ্রবণের' উপযুক্ত নয়। কামদেব, গোরক্ষনাথ, বাঘের পূজা, বিষকাঠি পূজা ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃষি সমাজের বহুল পরিচিত নানা ধরনের লৌকিক দেবতাদের উপাসনা ও উৎপাদন সংক্রান্ত নানা আচার কে পালন করা হয়। আবার এই আচারগুলোর সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকাজের নানা অনুষঙ্গ জড়িত থাকে। আবার এই সমস্ত আচারই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বহুজনসাধ্য। এইসব পূজায় গোষ্ঠীর লোকেদের কাছে মাস্তন ভিক্ষা করা হয় মাস্তনলব্ধ অর্থ দ্বারা প্রাপ্তরে 'সকল সকলে মিলিয়া পৃষ্ঠক ও পরমাম্মাদি' ভজন করে। কোন কোন আচারে 'হুমালি' বলে মল্লযুদ্ধের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কামদেব সম্বন্ধীয় গাথা গান করে জনসমাবেশের মনোরঞ্জন করা হয়। এইসব অনুষ্ঠানেই হাদি, হাজং, ডালু ও অন্যান্য অর্ধসভ্য জাতি একত্রে মদ্যপান করে এবং এই জাতীয় যৌথ অনুষ্ঠানকে 'পাবন' বলা হয়। হাজংরা যতই

⁶ A.E.Porter, Report on Bengal & Sikkim Vol. v Part-1,pp. 463-465.

⁷ W. Machruire, 10, C. Feb. J. C. 24th Feb.1997, Pro.No.12.

⁸ G.Alexander to W. Shakespeare,25th Jan, TDR,5th April,1831.No.10,C. Tucker 18th Sept. SBR, 19th March 1830,No.26.Para 2.

⁹ B.Cohn, 'Thr Crnsus,social Structure and Objectification in South East Asia ',Folk,Vol. 26,1984.

জাতে ওঠার চেষ্টা করুক না কেন, বিংশ শতকেও লোকাচারে তাদের আদি জনসংস্কৃতির ছাপ রয়েছে। পুরনো খানগুলোর উপরেই নতুন দেবতারা গজিয়ে উঠেছে মাত্র।¹⁰

আবার জাতে ওঠার আন্দোলনের গোষ্ঠীগুলোকে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুপুঞ্জ দ্বারা চিহ্নিত করার মধ্যে ক্ষমতাবিন্যাসের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। এই সাংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ খাদ্যাখাদ্য বিচার। মুঘল সেনাপতি মির্জা নাথনের চোখে গারোরা পাহাড়ি জাত, তারা লোহা ছাড়া আর সব খায়। তারা সর্বভুক, নির্বিচারে গাধা ও শূকারের মাংস খায়। লোহা খায় না কারণ লোহা শক্ত বলে চিবোতে পারে না।¹¹ আদমশুমারিতে যখনই জাতে ওঠার কথা বলা হচ্ছে, সংস্কৃতায়ণের কথা বলা হচ্ছে, তখনই বলা হয় মদ-মাংস পরিহারের কথা। সুতরাং সংস্কৃতির নিরিখে, খাদ্যা খাদ্যের মানদণ্ডে সভ্য ও অসভ্যের তফাৎ করা হচ্ছে। পরে সমাজের নানা ক্ষেত্রে এদের সংস্কৃতিকে মনে করা হচ্ছে ভদ্রলোকের 'রুচি-বিগর্হিত', ভাষা 'অতি কদর্য'; এরা 'ইতর লোক', অর্ধসভ্য জাতি; এদের তৈরি বস্ত্রও 'ভদ্রলোকের ব্যবহার্য নয়'। হর চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় এর বিবরণে সর্বত্র ভদ্রলোক সমাজ এবং অর্ধসভ্য জাতি ও ইতর লোকেদের সমাজের মধ্যে আলঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। সভ্যতা ও ক্ষমতার দীপ্তি প্রথমোক্তদের করায় দ্বিতীয়রা বঞ্চিত। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে তারাও অন্ধকার থেকে আলোকের পথযাত্রী হতে চেষ্টা করেছে এবং তখনই 'আহ্লাদের বিষয়ে এই যে, এই কুৎসিত প্রথা অল্পে অল্পে উঠিয়া যাইতেছে'। কিন্তু বিংশ শতকেও মুক্তগাছার চৌধুরীরা এইসব আদিবাসীদের হাদি, হাজং, মন্দাই বলে সাধারণ নাম দিচ্ছেন এবং তাদের সামাজিক মর্যাদায় নিচু জাত বলে চিহ্নিত করছেন।¹² এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব, অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান হাজংদের বাধ্য করত জমিদারদের হাতিখেন্দার কাজে বাধা দিতে, হাদীদের বাধ্য করতো ধার করা লাঠিয়াল হতে এবং অন্যান্যদের জমিদারের শিকারে বিনা ওজরে 'হাকোয়ার' কাজ করতে।

ইংরেজ সরকারের চোখে এই উপজাতিদের নিজস্ব চরিত্র আছে। বিদেশি শাসক এইসব গোষ্ঠীগুলোকে কতগুলো বিশেষ গুণে ভূষিত করে। এই গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে প্রথম অভিজ্ঞতা থেকেই গুণগুলো প্রসঙ্গে ধারণা জন্ম নেয়। দোষগুণের তালিকা করেই ইংরেজ শাসকরা জাত চিনতো। যেমন, ময়মনসিংহের গারোদের প্রসঙ্গে প্রথম পর্যায়ের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে: 'ব্যবহারে গারোরা সৎ ও সরল, মিথ্যা বলতে আদৌ অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এইসব ভালো গুণের বিপরীতে বলা যায় তারা অত্যন্ত নির্ধুর এবং বদমেজাজি। যদি অবস্থানে বা কোন এক বিশেষ দিকে মুখ করে কোন লোক খুতু ফেলেও হাসে তাহলে তারা সেরকম ব্যবহারকে হত্যা করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বলে মনে করে'।¹³

গারো উপজাতি ঘোরপ্যাঁচ জানে না, তবে সহজেই উত্তেজিত হয়। এর সঙ্গে পার্থক্য টানা হয়েছে সমতল ভূমির বাঙালি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বলা হয়েছে, 'গারোরা সুন্দর শক্ত সামর্থ্য জাতি, বাঙালিরা ভীর্ণ', (a fine hardy race of independent people, the Garod, who differs materially in manners, customs and language from the cowardly Bengalees) বাঙালিরা ধান্দাবাজ, ছলচাতুরিতে

¹⁰ জনসংস্কৃতির এই লৌকিক পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য হরচন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৯৫- ৯৭; সেন্সাস, 1933.

¹¹ Borah, vol. II, p. 528.

¹² হরচন্দ্র চৌধুরী, পূর্ব উল্লিখিত; ব্রজেন্দ্রনাথ আচার্যচৌধুরী, শিকার ও শিকারি, কলিকাতা, ১৩৩২, পৃষ্ঠা ১৬২।

¹³ H.W. messie's Letter, 29th April, J.C. 28 May, 1811, Pro. No. 37.

সিদ্ধহস্ত এবং তাদের কাছ থেকে গারোরা প্যাঁচ শিখে থাকে।¹⁴ গারো হাঙ্গামার অবসম্ভাবী কারণ হচ্ছে সমতলবাসি জমিদার ও বাসিন্দাদের লোভ। অর্ধসভ্য গারোরা সংযম জানে না ফলে বিদ্রোহ করে। ১৮২২ সালের সরকারি ঘোষনার ছত্রে ছত্রে গারো উপজাতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব উপজাতির সাধারণ জনগোষ্ঠীর থেকে একেবারে পৃথক।(race of people entirely distinct from the ordinary population)। এদের বিবাদ সমতল বাসীদের সঙ্গে(the reciprocal animosity which subsists between them and the inhabitants of the cultivated country)। এরা কাটখোড়া ও স্বাধীনতা প্রিয়। ‘এদের সভ্য সমাজে আনতে হবে’।(the desirable objects of reclaiming these tribes to civilized life)। ফলে এই গারো উপজাতিগোষ্ঠীর জন্য এমন পৃথক শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে যা এদের বিশেষ প্রথা ও ধ্যান-ধারণা সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ ও উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছে নৃতত্ত্ব ও সমাজবিদ্যার কতগুলো ধারণা। জাতি, উপজাতিকে কতগুলো গোষ্ঠী, কৌম, গোত্র ইত্যাদি বর্ণে ভাগ করে এবং প্রত্যেকটি ভাগকে কতগুলো নিহিত গুনে ভূষিত করলে শাসকদের সুবিধা হয়। অর্থাৎ লক্ষণ ও উপসর্গ দ্বারা রোগ নির্ণয় করে ওষুধ দেওয়া সুবিধা হয়। এ যেন এক মেটরিয়া-মেডিকার কাব্য। বর্গীকরণের এই পদ্ধতি অবশ্যই মহারানী শাসনে, আদমশুমারির কল্যাণে পূর্ণ তত্ত্বে রূপান্তরিত হয় এবং ক্রুক, ইবেটসন, রিজলি, রাসেল-হীরালাল, এনখোডেন প্রমুখো প্রথিতযশা সাহেবদের প্রামাণিক গ্রন্থে বর্ণ ও জাতিভেদের ছকে স্বভাবজাত গুণাগুণের নিরিখে ভারতীয় সমাজকে বিবৃত ও বিচার করার আদিকল্প জন্ম লাভ করে। জেলা গেজেটিয়ারে, ভূমি বন্দোবস্তের প্রতিবেদনে দেখা যায় তার অনন্তহীন পুনরাবৃত্তি, আর দেখা যায় বিংশ শতকের দেশী ও বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায় প্রশ্নহীনভাবে ওইসব আকর গ্রন্থের যথেষ্ট ব্যবহার। ফলে হরচন্দ্র চৌধুরীও ময়মনসিংহের গারোদের প্রসঙ্গ আরম্ভ করে এই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, ‘গারোরা স্বভাবত ভীরা, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ন, নৃশংস ও একগুঁয়ে ইহাদের মধ্যে বিলক্ষণ একতা দেখিতে পাওয়া যায়।’

এইরকম ধারণার উৎস ঊনবিংশ শতকের বিদেশি শাসকদের দলিলেই পাওয়া যায়, কারণ শাসন ও দমন করার জন্যই জেলাশাসকদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে শাসিত জনগোষ্ঠীকে কতকগুলি বর্ণধরা ও বোঝা, গুণাগুণের ভিত্তিতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য করে নীতি নির্ধারণ করা। তাই বাঙ্গালীদের সঙ্গে গারো জনগোষ্ঠীর পার্থক্য নির্ণয় করার সঙ্গে সঙ্গে কথা উঠে যে, ভাগলপুরের ক্লিভল্যান্ড সাহেবের উপজাতীয় নীতি গারো পাহাড়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ উপজাতির লক্ষণগুলো চেনা গেছে। সুতরাং দাওয়াই প্রয়োগ করতে বাধা নেই। ইংরেজি পত্রপত্রিকায় লেখা হয় যে বাঙালি সমতলভূমি বাসীদের হাতে পাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠীর দশা এইরকম, তা সাঁওতাল হোক, আরো হোক বা চকমা-ই হোক, অতএব সরকারকে একটি নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করতে হবে।¹⁵ অর্থাৎ যে উপনিবেশিক শাসন প্রসূত দলিল ও আকরের উপর নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর অনুপুঞ্জো বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তা এক বিশেষ আদি গল্প দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলত সেখানে বিভাজন ও বর্গীকরণ বেশি স্থান পেয়েছে। মার্গ সংস্কৃতির সঙ্গে ‘জন’ সংস্কৃতির আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার তথ্য বেশি পরিমাণ আছে। অথচ এটাও সত্যি যে, ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত শেরপুরে জনসংস্কৃতি ও লৌকিক আচার এইসব কৌম ও গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট জীবন্ত ছিল, শাস্ত্রিক আচারের তাগিদ ও চাপ তখন ক্ষীণ ছিল। বিংশ শতকেও অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই পরগনাতেও লোকাচার ও জনসংস্কৃতি মার্গ সংস্কৃতি

¹⁴ Martin, পূর্ব উল্লেখিত; পৃষ্ঠা ৬৮৮; D.Scott, 24th may, 1820, BR 18th June, para- 3, No. 30.

¹⁵ ১৮২২ সালের দলিল ও অন্যান্য উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য A. Mackenzie, পূর্বউল্লিখিত, পৃষ্ঠা ২৫০- ২৫২, ৫৫০- ৫৫৪।

ও শাস্ত্রীক আচারের সঙ্গে সহবাস স্থান করেছে, একেবারে লোপ পাইনি বা অঙ্গীভূত হয়নি। এইসব আচারে কৃষি জীবন ও যৌথ ক্রিয়াকলাপ এর চেতনা সুস্পষ্ট। মার্গ সংস্কৃতির সঙ্গে একীকরণের প্রশ্নে বৈষ্ণব ধর্মের ভূমিকার কথা বারবার বলা হয়েছে। অন্যদিকে এইসব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীতে বা সীমান্তবাসী কৃষক সমাজের নিজস্ব সত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নানা লৌকিক ধর্ম ও দেবতার অস্তিত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই মার্গ ও জনের টানাপোড়েন, বৈপরীত্য, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান এই অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট। অথচ আকর গ্রন্থে এরকম ধারণা দেওয়া হয় যে মার্গ সহজেই সরলরৈখিকভাবে জন কে আত্মসাৎ করে নেয়, উপজাতিগুলো রূপান্তরিত হয় জাতিতে, বর্ণ ব্যবস্থার নিম্নক্রমে তারা ঢুকে পড়ে। নীহার রঞ্জন রায়, নির্মল বসু, হিতেশ রঞ্জন সান্যাল ও সুরজিৎ সিংহ মহাশয়ের মূল্যবান গবেষণায় নিহিত ছকে সমাজের সাংস্কৃতিক একীকরণের প্রক্রিয়ার দিকেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কথা প্রসঙ্গে জন ও মার্গের দ্বৈত অস্তিত্বের কথা বলা হলেও সংঘাত ও বিরোধের কথা বলা হয় না। বলা হয় না কি করে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক কায়েমি স্বার্থের সুবিধার জন্য অনেক সময় কৌম ও গোষ্ঠী ভেঙে বর্ণসমাজে একীকরণের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া হয়। কৌম ভিত্তিক যৌথ গোষ্ঠী ধারণার মধ্যে বিভক্ত হওয়ার ইচ্ছাকে সংস্কৃতায়নের তাগিদে নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়।